দেশ খাদ্যে নয় চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ

খাদ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের সকল বিষয় সম্পর্কিত। বাংলাদেশ গরিব দেশ। বছর তিনেক হলো দেশ চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য খাবারের ঘাটতি প্রচুর। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শহর ও গ্রামের মানুষের খাদ্য বাজেট বাড়ছে। বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান**, সহযোগিতায় **নাসিম আহমেদ**

'দলীয় বিদ্বেষে অন্ধ না হলে অর্থমন্ত্রী বাঙালি জাতির খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিরাট সাফল্যকে এভাবে মিথ্যা প্রমাণের জন্য তথ্য বিকৃতির আশ্রয় নিতেন না'

মতিয়া চৌধুরী
১২ জুন সংবাদ সম্মেলনে

'গত তিন বছর দেশে কোনো খাদ্য আমদানি করতে হয়নি বরং একই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিলো'

আবদুল্লাহ আল নোমান
২৭ জুন, সংসদে খাদ্যমন্ত্রী

মাছে ভাতে বাঙালি এখন ডাল ভাতে জীবন ধারণ করতে চায়। বাজারে মাছের যে দাম তাতে সাধারণ মানুষ মাছ খাওয়া ভুলেই গেছে। মাছ থেকে যে আমিষ পাওয়া যেত এখন তা একটি তামাদি ধারণা। ডাল ভাতে বাঙালির ডালও এখন আর সহজলভ্য নয়। আগের দিনে কৃষকরা ধান চাষের পাশাপাশি ডালসহ রবি শস্যের চাষও করতো। তাতে মাছ ভাত না জুটলেও কৃষক ডাল দিয়েই চালিয়ে নিতে পারতো। ডাল এখনও বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারেই নিয়মিত খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বাজারে ডালের দাম কেজি প্রতি কোনোভাবেই ৩০ টাকার নিচে নামে না। অর্থাৎ ডাল এখন ধীরে ধীরে সাধারণ

ইলিশ এখন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে

মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে শাক-সবজির চাষও অপ্রতুল। গত কয়েক বছরে শাক-সবজির চাষ বাড়লেও দেশের মোট জনগণের জন্য তা যথেষ্ট নয়। এ পরিস্থিতিতে দেশ খাদ্যে কিভাবে ও কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সেটা একটা প্রশ্ন।

চাহিদা অনুযায়ী এখন মাছ থেকে আমিষ পাওয়া যায় না

খাদ্যে কতোটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে দেশে ধান বাদে আর সব খাদ্য শস্যের ঘাটতি রয়েছে। বিগত সরকারের শেষ দিকে দেশে প্রয়োজনের চেয়েও প্রায় ২৪ লাখ মেট্রিক টন ধান (চাল) কৃষকরা বেশি উৎপাদন করে। তৎকালীন সরকার তখন থেকে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে প্রচার করতে থাকে। সরকারের পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য সংস্থাও বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করে নেয় যে, বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এজন্য ফাও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে 'সেরেস' পদক দেয়। তখন থেকে মূলত দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কি না এই নিয়ে বিতর্কের শুরু। অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, চাল ছাড়া আর কোনো পণ্য বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয় না। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানেই কি দেশ খাদ্যে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? মানুষ কি শুধু ভাতই খায়, না সঙ্গে আরও কিছুর দরকার হয়? এ বিষয়ে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ফাও-এর কনসালটেন্ট খাদ্য গবেষণা কর্মকর্তা প্রত্যেকে স্বীকার করেন তারা চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলছেন। সাবেক খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'হ্যাঁ চাল যেহেতু আমাদের প্রধান খাদ্য সে কারণে আমরা এটাকেই প্রধান ধরছি। বাংলাদেশে আগে খাদ্যের অপ্রতুলতা ছিলো, মানে দেশের মানুষের দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা ছিলো না। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে মূল ব্যাপারটি হলো ভাত। ভাত ছাড়া আমাদের দেশের মানুষ বাঁচতে পারে না। এক প্লেট ভাত এদেশের মানুষ লবণ দিয়েই খেয়ে উঠতে পারে। এটা বাস্তবতা, এটা আপনাদের স্বীকার করতে হবে। পাশাপাশি চাল ছাড়াও শাক-সবজি, গবাদি পশু, হাঁস মুরগি, রবিশস্য সব কিছুর উৎপাদন অনেক বেড়েছে আমাদের সময়ে'। বিশ্বখাদ্য সংস্থার (ফাও) সিনিয়র কনসালটেন্ট ড. শওকত আলী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'খাদ্য খুবই স্পর্শকাতর একটা ব্যাপার। পাকিস্তান আমল থেকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা ছিলো। জনগণ যদি ঠিক মতো দু'বেলা খাবার পায় তাহলে সরকার দেশের সবচেয়ে বড় প্রেশার গ্রুপের দিক থেকে টেনশনমুক্ত থাকে। যে কারণে সব সরকারই সচেষ্ট থাকে জনগণের খাদ্য সরবরাহ যেন ঠিক থাকে। যে কারণে পূর্ববর্তী

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা ১৯৮৫/৮৬-২০০০/২০০১

(হাজার মেট্রিক টন হিসেবে)

	অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (সর্বমোট)									
বছর	ধান	গম	মোট ধান+ গম	মূল উৎপাদন (১০% বীজ, খাদ্য এবং ক্ষতি)	খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা (মাথাপিছু প্রতিদিন ৪৫৩.৬ গ্রাম খাবার ধরে)	খাদ্যঘাটতি (উদ্বৃত্ত)	ব্যক্তিগত আমদানি	অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের সহজলভ্যতা	মাথাপিছু প্রাপ্তি
৮৫/৮৬	১৫০৩৮	১০৪২	১৬০৮০	১৪৪৭২	১৬৫৯০	২১১৮		৩৪৯	১৫৬৬৪	৪২৮.৩০
৮৬/৮৭	১৫৪০৬	১০৯১	১৬৪৯৭	১৪৮৪৭	১৬৯৬০	২১১২		১৮২	১৬৭৮৯	৪৪৯.১৮
৮৭/৮৮	১৫৪১৩	১০৪৮	১৬৪৬১	১৪৮১৫	১৭৩৩৫	২৫২০		৩৭৫	১৬৯৪৫	৪৪৩.৪০
৮৮/৮৯	১৫৫৪৪	১০২১	১৬৫৬৫	১৪৯০৯	১৭৬৮২	২৭৭৪		৪১১	১৭৪৪২	৪৪৭.৪২
৮৯/৯০	১৭৮৫৬	৮৯০	১৮৭৪৬	১৬৮৭১	১৮০৩০	১১৫৯		৯৬২	১৮০৭৪	৪৫৪.৭০
৯০/৯১	১৭৮৫২	১০০৪	১৮৮৫৬	১৬৯৭০	১৮৩৭৮	১৪০৭		৭৮৩	১৮৫৫৮	৪৫৮.০৫
৯১/৯২	১৮২৫২	১০৬৫	১৯৩১৭	১৭৩৮৫	১৮৭০৯	১৩২৩		১০৩৫	১৮৬৯৫	৪৫৩.২৭
৯২/৯৩	১৮৩৪১	১১৭৬	১৯৫১৭	১৭৫৬৫	১৯০৪০	১৪৭৫	৩৫৫	২২৭	১৮৭৬৭	৪৪৭.১০
৯৩/৯৪	১৮০৪১	১১৩১	১৯১৭২	১৭২৫৫	১৯৩৭১	২১১৬	৩১২	১৬৬	১৮৭৭৭	৪৩৯.৬৮
৯৪/৯৫	১৬৮৩৩	১২৪৫	১৮০৭৮	১৬২৭০	১৯৭০২	৩৪৩২	১০১৪	২৭৮	১৮৫৮০	৪২৭.৭৫
৯৫/৯৬	১৭৬৮৭	১৩৬৯	১৯০৫৭	১৭১৫১	২০০৩৩	২৮৮২	৮৫০	৪০০	১৯৩৯৫	৪৩৯.১৫
৯৬/৯৭	১৮৮৮২	১৪৫৪.১	২০৩৩৬	১৮৩০৩	২০৩৬৪	২০৬২	২৩৭	৬১৫	১৯৩১৬	৪৩০.২৫
৯৭/৯৮	১৮৮৬২	১৮০২.৮	২০৬৬৫	১৮৫৯৯	২০৬৯৬	২০৯৭	১১৪৯	৬১৭	২০৭৫২	৪৫৪.৮২
৯৮/৯৯	১৯৯০৫	১৯০৮	২১৮১৩	১৯৬৩১	২১০২৭	১৩৯৫	৩৪৮০	৭৫৩	২৪৪৯২	৫২৮.৩৪
৯৯/২০০০	২৩০৬৭	১৮৪০	২৪৯০৭	২২৪১৬	২১৩৫৮	(১০৫৮)	১২৩৪	৯৬৭	২৪৫৮৩	৫২২.০৯
২০০০/২০০১	২৫০৮৫	১৬৭৩.৩	২৬৭৫৯	২৪০৮৩	২১৬৮৯	(২৩৯৪)	১০৬৩	১০৮৮	২৫৮২০	৫৩৯.৯৯

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ডি জি ফুড

সরকারগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো যে ভাবেই হোক দেশের সকল নাগরিকের খাদ্যের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা। সব সরকার সব সময় শুধু ধানের দিকে নজর দিতে গিয়ে অন্যান্য খাদ্য শস্যের দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। অন্যদিকে ইরিগেশনের প্রসার লাভ করায় সরকারের চাহিদার সঙ্গে এটা মিলে যায়। ধান আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য হওয়ায় সরকার সব সময় কৃষকদের ধান চাষেই উৎসাহিত করছে। অন্য দিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলছি কারণ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রতিদিন ১৬ আউন্স (৪৮০ গ্রাম) খাবার থাকলে সেই রাষ্ট্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বলে ধরে নেয়া হয়। এই হিসেবে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের মানুষ মূলত ক্যালরি পায় ভাত থেকে। আবার ক্যালরি চাহিদার কথা যদি বলেন তবে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে।' আন্তর্জাতিকভাবে ধরা হয় একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন প্রয়োজন ন্যূনতম ২২শ' কিলো ক্যালরি। উন্নত বিশ্বে একজন মানুষ গড়ে প্রায় ৩৩/৩৪শ' কিলো ক্যালরি গ্রহণ করে। বাংলাদেশে এর পরিমাণ গড়ে ১৭শ' থেকে ১৮শ' কিলো ক্যালরি। US AID-এর ASIA AND NEAREAST BUREAU'র ডেপুটি অ্যাসিসটেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গর্ডন ওয়েস্ট তার FOOD AND AGRICULTURE IN BANGLADESH : A SUCCESS STORY বিষয়ক প্রবন্ধের সাম্প্রতিক অবস্থা অধ্যায়ে উল্লেখ করেন 'আনুমানিকভাবে বাংলাদেশের ৩২ মিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন গড়ে ১৮শ' ক্যালরি খাবার গ্রহণ করতে পারে না।' এই প্রবন্ধেই বলা হয়, বাংলাদেশে গড়ে মানুষ প্রতি ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ২১০৫, যেখানে উন্নয়নশীল দেশে ক্যালরি গ্রহণের গড় ২৬২৮, উন্নত বিশ্বে তা ৩৩৭৭।

বলা হয় ডাল হলো গরিবের প্রোটিন। আর ক্যালরি গ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করে মানুষের আয়ের

বাংলাদেশের উৎপাদনের অবস্থা

(হাজার মেট্রিক টন হিসেবে)

খাদ্য শস্য	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-০১
আউশ	১৬১৭	১৭৩৪	১৯১৬
আমন	৭৭৩৬	১০৩০৫	১১২৪৯
বোরো	১০৫৫২	১১০২৭	১১৯২১
গম	১৯৮৮	১৮৪০	১৬৭৩
যব	৫	৫	-
রবি এবং বাড়ই জোয়ার	**১**	**১**	-
বাজরা	০.০৩	-	-
ভুট্টা	৩	৪	-
চীনা	১৩	১২	-
অন্যান্য	৪২	৪৩	-
ডাল			
মুগ	৩৪	৩৬	-
মসুর	১৬৫	১২৮	১২৬
অড়হর	৩	৩	-
মাসকলাই	২০	২১	২০
খেসারী	১৬৬	১৬৬	১৫৫
গড়িকলাই	০.৩৮	-	-
মটর	১৩	১৪	-
অন্যান্য	০.৩	৪	-
তেলজাত বীজ			
তিল	২১	১৫	১৫
সরিষা	২৫৩	২৪৯	-
রবি ও বাড়ই	৩৯	৪২	-
অন্যান্য তেলজাত বীজ			
ক্যাস্টর	০.২৫	০.২৫	-
নারকেল	৮৯	৮৯	-
লীন সীড	৪৬	১৫	-
মশলা			
মরিচ (খারিফ)		১৯	১৯ ১৯
মরিচ (রবি)	১২৩	১২৪	১২২
পেঁয়াজ	১৩১	১৩৪	১২৭
রসুন	৩৮	৪০	৩৯
হলুদ	৪১	৪১	-
আদা	৩৮	৩৮	৪২
ধনিয়া	৪	০৪	-
অন্যান্য	১	১	-
চিনি			
ইক্ষু	৬৯৫১	৬৯১০	৬৭৪২
খেজুর	২৪৮	২০৫	২০৯
তাল	৮৪	৮৭	৯১
আঁশ জাতীয়			
পাট	৮১২	৭১১	৮২১
তুলা	-	-	-
বাড়ই জাতীয় শস্য	-	০.০২	০.০১
রবি জাতীয় শস্য	১	০.২৯	-
মাদকদ্রব্য			
চা	৫৬	৪৬	৫২
তামাক	২৯	৩৫	-
সুপারী	২৮	৪৪	৪৫
পান	৭৪	৭৯	-

খাদ্য শস্য	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-০১
ফল			
কলা	৫৬২	৫৭২	-
আম	১৮৭	১৮৭	-
আনারস	১৪৬	১৪৮	-
কাঁঠাল	২৬৭	২৬৭	-
পেঁপে	৪০	১২	-
তরমুজ	৯৭	৭৯	৮৫
লিচু	১৩	১৪	-
বাতাবী লেবু	১৩	১৫	-
বার	১৫	১৬	-
কমলালেবু	১	১	১
পেয়ারা	৪৬	৪৮	-
পরমেলো	১৫	১৬	-
শীতকালীন ফসল/সবজি			
বেগুন	২৯৩	২৭৯	-
ফুলকপি	৮০	৮০	৭৯
বাঁধাকপি	১১৫	১১২	১১৫
কুমড়া	৬৬	৬৬	-
টমেটো	৯৮	১০০	১০০
মুলা	১৯৭	২০০	-
শিম	৪৯	৪৬	-
পালং শাক	২৫	২৬	২৭
গ্রীষ্মকালীন সবজি			
কুমড়া	৩৭	৪১	৪৩
বেগুন	১১১	১১৪	১১২
পটল	৪৫	৪০	৪০
রেখা	১৭	১৮	১৯
ঝিংগা	২৬	২৭	২৮
করল্লা	২০	২০	২২
আরুম	১০৯	১৩৫	১৪০
পুঁই	১৭	১৭	১৭
চিচিংগা	১১	১২	১১
বরবটি	৮	৯	৯
শসা	১৯	২০	২১
চালকুমড়া	১৮	১৯	২০
ডাটা	২০	২০	২১
অন্যান্য	১০	১০	-
অন্যান্য শস্য			
আলু	২৭৬২	২৯৩৩	৩২১৬
মিষ্টি আলু	৩৮৩	৩৭৮	৩৫৭
জাবনা			
রবি	৯	১০	৪
বাড়ই	২	১১	-
অন্যান্য			
তুঁত	৭	৭	৬

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

ওপর।

দীর্ঘ জীবন ধারণের ব্যাপারটি নির্ভর করে একজন মানুষ প্রতিদিন কি পরিমাণ সুষম খাদ্য গ্রহণ করে। সুষম খাদ্যের মধ্যে ভাত একটি উপাদান মাত্র। শুধু ভাত খেয়ে মানুষ হয়তো বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ শরীরের জন্য ভাত একমাত্র উপাদান হতে পারে না। এটা সর্বজনস্বীকৃত।

রাজনীতিবিদরা দাবি করেন দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ মাংস ও ফলের জন্য আমাদের ইন্ডিয়ার গরু ও বিদেশী ফলের উপর নির্ভর করতে হয়

স্বয়ংসম্পূর্ণ কিসে : খাদ্যে না চালে

চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা মানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়। খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্য গবেষণা কর্মকর্তা রুহুল আমিনও স্বীকার করলেন। তিনি বলেন, 'পত্রিকাগুলো এই বিশ্লেষণটা কেন লিখছে না। বাংলাদেশে খাদ্যাভ্যাসে যেহেতু চাল ও গম প্রধান উপাদান সে জন্য আমরা এই দুইটি খাবারের হিসাব রাখি। বাংলাদেশ চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ছাড়া অন্যান্য সকল খাদ্যে আমাদের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। তিন বছর যাবৎ চাল ছাড়া আর সব কিছুই বাংলাদেশ সরকারকে আমদানি করতে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করি চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে আংশিকভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ফুড বাস্কেট দেখলে আমিও আপনার সঙ্গে একমত যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না।'

চালের পাশাপাশি গম এদেশের মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। কিন্তু দেশের গম উৎপাদনের চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। খাদ্য গবেষণা কর্মকর্তা রুহুল আমিন জানান, 'প্রতিবছর গমের চাহিদা ৩০ লাখ মেট্রিক টন, দেশে উৎপাদন মাত্র ১৫ লাখ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ঘাটতি থাকে ১৫ লাখ মেট্রিক টন।' সরকার এই চাহিদা মেটায় গম আমদানি করে। আবার সরকার খাদ্য শস্য সাহায্য হিসেবে গমও পেয়ে থাকে। অবশ্য সরকার প্রতিবছর কি পরিমাণ গম আমদানি করে তার সঠিক কোনো হিসাব পাওয়া না গেলেও জানা যায়, উৎপাদনের পর চাহিদা অনুসারে গম আমদানি করতে হয়। জানা গেছে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ কমে গেছে। ২০০০-০১ সালে খাদ্য সাহায্য পাওয়া গিয়েছিলো ৬০০ হাজার মেট্রিক টন। এই হিসাব ২০০১ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। একই অর্থবছরে প্রাইভেট সেক্টর হতে ১.০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়েছিলো। এটা গেল একটা দিক। অন্যদিকে খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য তথা পুষ্টির বিষয়টিও সম্পর্কিত। পাশাপাশি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, মাথাপিছু আয়, দারিদ্র্য বিমোচন এমনকি দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের বিষয়গুলোর সঙ্গেও খাদ্যের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য গবেষণা কর্মকর্তা রুহুল আমিন সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'এখানে আমরা তিনটি বিষয় বিবেচনা করি। যেমন খাদ্যের সহজলভ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টিমান।' দেশ যখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তখন স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে বাংলাদেশে কি খাদ্যের সহজলভ্যতা আছে। মানুষের খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা কতটুকু, খাদ্যের পুষ্টিমূল্য কতখানি? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে সাপ্তাহিক ২০০০ থেকে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। US AID-এর গর্ডন ওয়েস্ট তার একই প্রবন্ধে CHALLANGES AHEAD চ্যাপ্টারে এক জায়গায় উল্লেখ করেন, পুষ্টিহীনতার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ শীর্ষের দিকে রয়েছে। জাতীয় পর্যায়েও পুষ্টির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পুষ্টিহীনতার শিকার সবচেয়ে বেশি নারী ও শিশুরা। পুষ্টিহীনতার মূল কারণগুলো হলো– পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান, বিতরণ ব্যবস্থা এবং মানুষের আয়। আয় সীমা খুব বেশি নয়। তবে খাদ্যের অপর্যাপ্ততার কারণেই পুষ্টিহীনতার মূলে। গুঁড়ো দুধের ওপরে বর্তমান সরকারের অতিরিক্ত কর আরোপ মানুষকে বিশেষ করে শিশুদের বিপদে ফেলবে। যেমন ফেলেছে ডাল, সবজির অপর্যাপ্ততায়। ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেলে মানুষ তখন অন্য পণ্যের বা খাদ্যের দিকে ঝোঁকে। অথচ দুঃখজনক হলেও বিকল্প খাদ্য বা খাদ্য ব্যবস্থা এদেশে এখনও গড়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৪২ সংখ্যা বর্ষ ৪-এ বিশ্ব নারী দিবসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিলো। বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। দেশের শতকরা ৮৪ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এবং এই জনসংখ্যা কোনো না কোনোভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশের মোট জিডিপির ৩১.৬ শতাংশ আসে কৃষিখাত থেকে। পুষ্টিহীনতার শিকার অধিকাংশই গ্রাম এলাকা ও অল্প আয়ের মানুষ। বাংলাদেশের ৫ বছরের কম বয়স্ক ৬০ শতাংশ শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলা ও শিশু অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। এই অপুষ্টির প্রধান ও অন্যতম কারণ হচ্ছে খাদ্য। পুষ্টির অবস্থা এতোটাই খারাপ যে বাধ্য হয়ে সরকার জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪০ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। পুষ্টি ছাড়াও দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিও মারাত্মক। বলা হচ্ছে, দেশের দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান। বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যের উপস্থিতি সুবিস্তৃত ও গভীর। সর্বশেষ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত Preliminary Report of House Hold income and Expenditure survey 2002 -এর প্রতিবেদনে বলা হয় দৈনিক মাথা পিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ পরিমাপে ২০০০ সালে বাংলাদেশে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪২.৩ শতাংশ মানুষ ছিলো দারিদ্র্যসীমার নিচে। দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরি গ্রহণ পরিমাপে ১৮.৭ শতাংশ মানুষ ছিলো চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছরে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিলো ৬১.৯ শতাংশ। ২০০০ সালে সেটা কমে ৪২.৩ শতাংশে নেমে আসে। দরিদ্রের সংখ্যা কমে

শুঁটকি মাছ দামের কারণে সাধারণ মানুষ খাওয়া বাদ দিয়েছে বলা যায়

এলেও বাস্তবতা হচ্ছে দেশের এই পরিমাণ লোক প্রতিনিয়ত খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করছেন। ২০০০ সালে শহর অঞ্চলে ৫২.৫ শতাংশ দারিদ্র্য এবং ২৫.০ শতাংশ চরম দারিদ্র্য বিরাজ ছিলো। একই প্রতিবেদন অনুসারে ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩৩.৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যের পর্যায়ে রয়েছে এবং ৪৯.৮ শতাংশ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৪ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে ৫০ ভাগের বেশি জনগণ দরিদ্র। ১৯৮৬ সালে সরকারি হিসাব মতে শহর ও গ্রামে মাথাপিছু গড় ক্যালরি গ্রহণের পরিমাপ ছিলো যথাক্রমে ২১০৭ ও ২২০৩ কিলো ক্যালরি। ২০০০ সালে যেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২১৫০ ও ২২৬৩ কিলো ক্যালরি। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা সরকারের এই হিসাব মানছেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক ড. কাজী সালামতুল্লাহ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশের বিরাজমান অপুষ্টির অবস্থা দেশের মানুষ এতোটা ক্যালরি পাচ্ছে সেটা নির্দেশ করে না। শহরাঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে একটি বিশেষ শ্রেণী প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করে সত্য। সার্বিকভাবে দেশের মোট জনগণ আরও কম ক্যালরি পাচ্ছে বা গ্রহণ করছে।' গর্ডন ওয়েস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ৪৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। দেশের ২৮ শতাংশ মানুষ প্রতিদিন জীবন ধারণ করতে এক ডলার বা ৬০ টাকারও কম খরচ করে। এ অবস্থায় দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলাটা কতোটা যৌক্তিক? ড. কাজী সালামতুল্লাহ বলেন, 'সাধারণ একজন সুস্থ মানুষের খাদ্য তালিকায় ভাত বা রুটি, মাছ বা মাংস, ডাল, শাক-সবজি, ফল খেতে হবে। ভাতের সঙ্গে আপনাকে একটা তরকারি খেতে হবে। তরকারির জন্য পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ আরও অন্যান্য মসলা থাকবে। যেটা আপনার চাই-ই চাই। আমি বললাম এটা সাধারণ অবস্থা। '৬২ থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো খাদ্য সংক্রান্ত জরিপ হয়েছে তাতে দেখা যায় গড়ে ২৫০ কিলো ক্যালরি গ্রহণ কমে গেছে। আমাদের ভিটামিন 'এ'র অভাব রয়েছে। প্রতিদিন আমাদের তেলের প্রয়োজন ২০/৩০ গ্রাম। আমরা পাচ্ছি ৮/৯ গ্রাম। শর্করা, আমিষ, তেল, লবণ, প্রোটিন এগুলোও আমাদের দরকার। এগুলো কি আমাদের পরিপূর্ণভাবে আছে? নেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে চাল বাদে অন্যান্য খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। মোটামুটিভাবেও যদি আমরা এই চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারি তবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দাবি করা যেতে পারে।' সুতরাং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার এই রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা অনভিপ্রেত বলা যায়। চাল এবং গম ছাড়া অন্যান্য যেমন পেঁয়াজ-রসুন, আদা, ভুট্টা, শাক-সবজি, ফল, আলুর চাহিদা দেশে কত? এ বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তর, বিবিএসের কৃষি প্রকল্পসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি। খাদ্য গবেষণা কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, আমরা চাল ও গম ছাড়া অন্য কোনো পণ্যের খবর রাখি না। কারা এই বিষয়ে ভালো জানতে পারে সে খবরও তিনি দিতে পারলেন না।

খাদ্য বাজেট এবং বাস্তবতা

২০০১-০২ অর্থ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২৭৯.৩০ লাখ মেট্রিক টন। নীট খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয় ২৫১.৩৭ লাখ মেট্রিক টন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে দেশে খাদ্যের চাহিদা ২২০.২০ লাখ মেট্রিক টন ধরা হয়েছে। শহরে ১৯৯৯ সালের মে মাসের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দরিদ্রদের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ছিলো ১৯২২.৬ কিলো ক্যালরি। অন্যদিকে সচ্ছল পরিবারের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ছিলো ২৫০৭.৫ কিলো ক্যালরি। দরিদ্র পরিবারের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ এপ্রিল ১৯৯৮-এ ছিলো ১৯৫৮.৮ কিলো ক্যালরি। শহরে দরিদ্র পরিবারের ক্যালরি গ্রহণ কমেছে ভোজ্য তেল, আলু এবং চাল গ্রহণে। অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে এই তিনটি ক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র পরিবার তাদের ক্রয়সীমার মধ্যে এই প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যগুলো কিনতে পারছে না। গ্রামের দিকে তাকালে সেখানেও দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের আলু গ্রহণ কমে গেছে। ১৯৯৯ সালে দরিদ্র পরিবারের কিলো ক্যালরি গ্রহণ ছিলো মাথাপিছু ১৯৩২.০, সচ্ছল পরিবারের ছিলো মাথাপিছু ২৫৫৫.৩ কিলো ক্যালরি। শহরের দরিদ্র পরিবারগুলো (মে ১৯৯৯)-এ খাদ্যে মাসিক ব্যয় করে মাথাপিছু ৪৪৩.২ টাকা। সেখানে গ্রামে দরিদ্র পরিবারগুলোর ব্যয় মাথাপিছু ৩৩০.২ টাকা। শিক্ষা খাতে দরিদ্র পরিবারগুলো শহরে থেকে ব্যয় করছে মাথাপিছু ৯.৬ টাকা। গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলো খরচ করছে মাথাপিছু ৩.৮ টাকা। শহরের সচ্ছল পরিবারগুলো শিক্ষায় ব্যয় করছে মাসিক মাথাপিছু ৭৫.৩ টাকা। গ্রামের সচ্ছল পরিবারগুলোর ব্যয় মাথাপিছু ২০.৫ টাকা। শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারগুলোর পেছনে পড়ে থাকা থেকে বোঝা যায় এই পরিবারগুলো পণ্যের ক্রয়সীমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে অন্যান্যখাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হচ্ছে। অতিরিক্ত কর এবং সেই অনুপাতে আয় সীমা বাড়ছে না। এ জন্যই ১৯৯৯ সালে শহরের দরিদ্র পরিবারকে শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হচ্ছে মাথাপিছু ৯.৬ টাকা। যেখানে ১৯৯৮ সালে তারা ঐ একই খাতে মাসিক ব্যয় করছিলো মাথাপিছু ১৫.৫ টাকা। সরকারের অপরিকল্পিত পদক্ষেপ, অপর্যাপ্ত খাদ্য এবং সীমিত আয়ের সুযোগের কারণে সচ্ছল পরিবার ছাড়া বাকি সবাই পিছিয়ে পড়ছে। খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অপরিহার্য ক্ষেত্রে ব্যয় কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে।

চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অনেক বড় অর্জন

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই দেশ এখন খাদ্য বাস্কেটের প্রধান উপাদানে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই অর্জন মোটেই ছোট কোনো বিষয় নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ৪/৫ বছর আগেও বাংলাদেশ সরকারকে খাদ্য সাহায্য ও আমদানির ওপর নির্ভর করতে হতো। বিগত তিন বছর সরকারকে কোনো চাল আমদানি করতে হয়নি। আগামীতে ভয়াবহ বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে চাল সরকারকে আমদানি করতে হবে না। বর্তমান সরকারের খাদ্যমন্ত্রীও সংসদে স্বীকার করেছেন যে, খাদ্যে নিজেদের ওপর নির্ভরশীলতা এসেছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে তৎকালীন সরকার চাল ও গম আমদানি করেছিলো ৩১২৮ হাজার টন। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ৪০০৪ হাজার মেট্রিক টন। সেখানে

মাত্র ৫ বছর পর একটি সরকার চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনেছে। রাজনৈতিকভাবে এই অর্জনকে ছোট করে দেখা হলেও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। শুধু ধানেই নয়, বিগত সরকারের সময় খাদ্য বাস্কেটের অনেকগুলো উপাদানের উৎপাদন পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ সালের এ পরিসংখ্যানে বলা হয় দেশে ১৯৯৫-৯৬ সালে মাছের মোট উৎপাদন ছিলো ১২.৫৮ লাখ মেট্রিক টন। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭.৬৩ লাখ মেট্রিক টনে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা ছিলো ৪.১৯ কোটি ও ১১.০৫ কোটি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৫২ কোটি এবং ১৫.১২ কোটি। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে দুধ ও মাংসের উৎপাদন ছিলো ১৩.৫২ লাখ মেট্রিক টন ও ৪.৬০ লাখ মেট্রিক টন। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬.০ ও ৬.২০ লাখ মেট্রিক টন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রপ্তানি নীতিতে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত সুবিধা দেয়ার কথা উল্লেখ ছিলো। শাক-সবজি ও ফলমূল রপ্তানির জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী জোরদার করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ খাতে ১৪.৫ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় হয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৪০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। পাশাপাশি ১৯৯৭-৯৮ সালে ইউরোপীয় ভোক্তাদের জন্য ফ্রেঞ্চ বীন, কাঁচা মরিচ ও ঢেঁড়শ রপ্তানি করে। পরবর্তী বছরে বাংলাদেশ হতে প্রথমবারের মতো ইউরোপে ছোট আকারের আনারসও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রপ্তানি হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কায় আলু রপ্তানি করে। একই বছর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় উন্নতমানের সরু চাল রপ্তানি হয়।

গত কয়েক বছরের কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর বিভিন্ন জরিপ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (১৯৯১-৯৬) বিএনপি সরকারের তুলনায় আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিখাতে বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জন করে। বর্তমান সরকারও একই ধারা অব্যাহত রাখলে আগামীতে কোনো একদিন হয়তো বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। প্রশ্ন হচ্ছে সেই দিন কবে? আদৌ কি সেই দিন আসবে? না কি রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে মন্ত্রীরা সংসদে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার করে যাবেন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশ ও জাতিকে পুরো সত্য তথ্য দেননি। মজার ব্যাপার হলো, এই অর্থমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২-এ খাদ্যে বিগত সরকারের সাফল্য দেখানো হয়েছে।

খাদ্য ও রাজনীতি

খাদ্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক গভীর। ড. শওকত আলী সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, '১৯৫৪ সালে ঢাকায় খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা হয়েছিলো। দুটি কারণে খাদ্য খুব স্পর্শকাতর। কারণ চাল রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। অন্যদিকে চালের আন্তর্জাতিক বাজার খুব ছোট। যে কারণে সরকারকে সব সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চালের মজুত রাখতে হয়। আর একটা জিনিস আপনাদের বুঝতে হবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্থ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়। খাদ্য শস্যে সব রকমের খাদ্য যোগ হতে হয়।'

যে দেশের মানুষের পেটে ক্ষুধা আছে সে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য। একটি রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন সেই সরকারের লক্ষ্য থাকে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রুপ যেন বিক্ষুব্ধ বা বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে। কারণ উৎপাদন না হলে তার জন্য সরকারকে দেশে বিদেশে দাতা সংস্থার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। বাংলাদেশ যেহেতু কৃষি ভিত্তিক দেশ সেহেতু সব সরকারের লক্ষ্য থাকে এই শ্রেণী যেন সন্তুষ্ট থাকে। বাংলাদেশে বাস্তবতা ভিন্ন হলেও বিগত সরকার কৃষিখাতে ২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছিলো। পাশাপাশি ১৯৯৯ সালে কৃষি নীতি প্রণয়ন ও কৃষককে সন্তুষ্ট রাখাকেই ইঙ্গিত করে। পাশাপশি বিগত সরকারের সময় কৃষকের কাছে ঠিক মতো সার সহ কৃষি উপকরণ পৌঁছেছে সময় মতো। অনেকেই স্বীকার করেন কৃষি খাত নিয়ে সরকারের আন্তরিকতা ছিলো বলেই চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়। ১৯৯৫ সালে দেশে মারাত্মক ইউরিয়া সারের সংকট দেখা দেয়। সে সময় সার চাইতে এসে ১৮ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এই ঘটনার ফলও পায়। বর্তমান বিশ্বে আত্মনির্ভরশীলতার বিকল্প নেই। কৃষিখাতে উন্নতি করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা। পাশাপাশি কৃষকের কাজের জন্য পুরস্কার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকেই। কৃষি কাজের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে দিন দিন। কৃষির উন্নতির জন্য সহজলভ্য প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে তারাই এ দেশটাকে বদলে দিতে পারে। কৃষকের উৎপাদন কাজে সহযোগিতা করলেই চলবে না, পাশাপাশি কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি পণ্য রপ্তানি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলাও জরুরি।

অসহায় এসব মানুষের দুমোঠো খাবারের নিশ্চয়তা নেই অথচ দেশ খাদ্যে...

খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক কৃষকের। সেই কৃষকই আবার সংকটে ভোগে সবচেয়ে বেশি। আবার তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও কৃষক ঠিকমতো পায় না। লাভ খেয়ে যায় মধ্যস্বত্বভোগীরা। চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রতিদিন ঠিকমতো খাদ্য পায় এই ধারণা ঠিক নয়। এর কারণ খাদ্য বিতরণের জন্য সঠিক কোনো পরিকল্পনা নেই। সরকার ঠিকমতো ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে পারলে এই দেশের কৃষকরাই দেশকে একদিন খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে। যদিও প্রতিবছর ৮২ হাজার হেক্টর কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। এখন সরকার যদি এসব দিকে নজর দেয় তবে এদেশের অগ্রগতি রুখবে কে? এ জন্য সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের। সরকারি দল-বিরোধী দলের সমন্বিত সিদ্ধান্তই জনগণের খাদ্যসহ অন্যান্য বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।